নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস

২৫ জুন ২০২৫

২৬ জুন জাতিসংঘ ঘোষিত নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস। ১৯৮৮ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে। যাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হয়েছেন তাঁদের প্রতি সংহতি জানাবার দিন এটি। এই দিনে *অধিকার* পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অত্যাচার-নির্যাতনসহ নানান নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ ও সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের প্রতি সংহতি জানাচ্ছে। *অধিকার* একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের নিয়ে নির্যাতন বিরোধী র‍্যালি এবং মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর *অধিকার* প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই নির্যাতন প্রতিরোধ করা এবং এই ব্যাপারে কার্যকরী আইন প্রণয়ন ও এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নসহ মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রচারাভিযান চালিয়ে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে প্রতিটি সরকারের আমলে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। তবে শেখ হাসিনার সরকারের আমলে তা চরম আকার ধারন করে। গুম করে নির্যাতন, কারাগারে নির্যাতনের ঘটনার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। এই সময় র‍্যাব, পুলিশ এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে ব্যবহার করে নির্যাতন, গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনাও ঘটে। *অধিকার এর* সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী শেখ হাসিনা সরকারে আমলে ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট পর্যন্ত ১৮২ ব্যক্তি নির্যাতনের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে ২০২৪ এর ৯ অগাস্ট থেকে ২০২৫ সালের ২০ জুন পর্যন্ত ১০ ব্যক্তি নির্যাতনে মৃত্যুবরন করেন।

নির্যাতনের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে দায়মুক্তির সংস্কৃতি চালু থাকা এবং এটি বন্ধে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩- এর বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণেই বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের ঘটনাগুলো অব্যাহতভাবে ঘটছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা একে প্রকট করে তুলেছে।

বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক হলেও নির্যাতনের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পুনরায় নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয়ে নির্যাতিতরা মুখ বন্ধ করে থাকেন। সাধারণত: রিমান্ডে নিয়ে তথ্য বা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায়ের জন্য, মিথ্যা বক্তব্য নেয়া এবং ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদের শায়েস্তা করার জন্য নির্যাতন চালানো হয়ে থাকে। কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের

আমলে বিরোধীদলের নেতা-কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। বর্তমান অন্তবর্তী সরকারের সময়ে নির্যাতন কমে আসলেও তা অব্যাহত আছে।

রিমান্ডের অপর নাম টর্চার, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অথচ নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্যাতন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী কনভেনশন অনুযায়ীও নির্যাতনের শিকার না হওয়া অলঙ্ঘনীয় অধিকার। কোন রাষ্ট্রই কোন পরিস্থিতিতে সে অধিকার খর্ব করতে পারে না, হোক তা যুদ্ধাবস্থা, জরুরী অবস্থা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কিংবা অন্য যেকোন বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কিত।

বাংলাদেশে থানা, ডিটেনশন সেন্টার, গোপন বন্দিশালা ও কারা হেফাজতে মানুষ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন, নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের শিকার হয়ে থাকেন। ফলে আটক ব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদাহানি ঘটে এবং তাঁরা নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন হন। আন্তর্জাতিক সনদ অনুযায়ী কোনো ডিটেনশন সেন্টার, কারাগার বা হেফাজতে কোন অজুহাতেই কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ করা বা শাস্তি দেয়া যাবে না।

১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতিসংঘ প্রণীত নির্যাতনের বিরুদ্ধে কনভেনশনের ১৪(১) অনুচ্ছেদ এর ওপর আপত্তি জানিয়ে আন্তর্জাতিক সনদ গ্রহণ করেছে এবং কনভেনশন অনুমোদনকারী প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষ তাদের জাতীয় আইনে নির্যাতনকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে সম্মত হয়েছে।

১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রণীত নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সনদের ১৪(১) অনুচ্ছেদ এর ওপর আপত্তি দিয়ে সনদটি অনুমোদন করে বাংলাদেশ। এই অনুচ্ছেদে ভিকটিমকে যথাসম্ভব পরিপূর্ণ পুনর্বাসনের বন্দোবস্তসহ পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ কনভেনশনের ২২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে গঠিত কমিটির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আবেদন গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি করার ক্ষমতাও স্বীকার করেনি। বাংলাদেশে নির্যাতন বিরোধী আইন পাশ হলেও এখনও পর্যন্ত কনভেনশনের পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা অনুসরন করা হচ্ছে না।

নির্যাতন মানবাধিকার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় একটি বড় বাধা। *অধিকার* বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং সেখানে মানবাধিকার ও আইনের শাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে *অধিকার* অবিলম্বে নির্যাতন বিরোধী আইনের বাস্তবায়নসহ বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কনভেনশনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং সেই সঙ্গে কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এর অপশনাল প্রোটোকল অনুমোদনের দাবি

জানাচ্ছে। *অধিকার* জনগণকে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন হবার পাশাপাশি নির্যাতন বন্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবারও আহবান জানাচ্ছে।

***অধিকার* নির্যাতন বন্ধে কয়েকটি সুপারিশ পেশ করছে:**

১. বাংলাদেশ সরকারকে অপশোনাল প্রটোকল অব কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার অনুস্বাক্ষর করতে হবে। দেশে একটি জাতীয় প্রতিরোধ এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা তৈরীসহ নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা মানতে হবে। অবিলম্বে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়নসহ সব ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে এবং দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

২. মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং নির্যাতন বন্ধে অবিলম্বে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে তদন্ত এবং মোকদ্দমা দায়ের ও পরিচালনার ক্ষমতা দিয়ে একটি সত্যিকারের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৩. নির্যাতনের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে বহাল দায়মুক্তির সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। নির্যাতনের লক্ষ্যে বিদেশ থেকে বিভিন্ন সরঞ্জামাদী আমদানি করা এবং তাদের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

৪. ২০০৩ সালে *ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ* মামলায় দেয়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. বিচারিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের কর্মকাণ্ডে কোনভাবেই বাধা দেয়া চলবে না।

৬. এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, কোন ম্যাজিস্ট্রেট এমন কোন স্বিকারোক্তিমূলক বক্তব্য যা নির্যাতনের মাধ্যমে বা নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে দেয়ার সুযোগ রয়েছে তা গ্রহন করবেন না এবং কোন ম্যাজিস্ট্রেট এমন কোন বন্দি ব্যক্তিকে রিমান্ডে ফেরত পাঠাবেন না যাঁর বন্দি অবস্থায় নির্যাতিত বা নিষ্ঠুর আচরনের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।